গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২০ - ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

২১ জানুয়ারি

মহান লেনিন স্মরণে

জন্ম ঃ ২২ এপ্রিল ১৮৭০
মৃত্যু ঃ ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

"ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে পৌঁছনোর মধ্যবর্তী সময়টা একটা সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ। এই যুগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শোষকরা ক্ষমতা পুনরাধিকারের আশা নিশ্চয় পোষণ করবে এবং এই আশা ক্রমশ চেষ্টায় পরিণত হবে। তারা যে ক্ষমতাচ্যুত হবে শোষকরা কখনও এটা আশাই করেনি, এটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করেনি, এ কথা কখনও চিন্তাই করেনি। তাদের পরিবারবর্গ কেমন পরম সুখে, নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করত, আর এখন 'সাধারণ ছোটলোকগুলো' তাদের সর্বনাশ করছে। দুর্দশার চরম করে ছাড়ছে (অর্থাৎ 'সাধারণ কাজ' করতে বাধ্য করছে। প্রথম গুরুতর পরাজয়ের পর তারা তাই পরিবারবর্গের জন্য 'নষ্টনীড়' ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড শক্তিতে, তীব্র বিদ্বেষে শতগুণ ঘৃণাভরে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ... এইসব পুঁজিপতি শোষকদের পিছু পিছু দেখা যায় বিরাট সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া জনসাধারণকে। প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, তারা হল অস্থিরমতি, দোলায়মান চিত্ত— একদিন দেখা গেল তারা শ্রমিকশ্রেণির পিছনে চলছে, আর পরের দিন দেখা গেল বিপ্লবের নানা সমস্যা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেছে। শ্রমিকদের প্রথম পরাজয়েই কিংবা আধা-পরাজয়েই তারা ভয় পেয়ে যায়; ভড়কে গিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি লাগিয়ে দেয়, নাকি কান্না শুরু করে আর এক শিবির থেকে গিয়ে ভেড়ে অন্য শিবিরে।

শোষকরা যদি মাত্র এক দেশে ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং সাধারণত এটাই ঘটে, কারণ একসঙ্গে অনেকগুলো দেশে বিপ্লব দুর্লভ বস্তু, তাহলে তারা তখনও শোষিতদের চেয়ে বেশি শক্তিশালীই থাকে।

ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াদের মূল শক্তি কোথায়? ...আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের শক্তির মধ্যে, বুর্জোয়াদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শক্তি আর দীর্ঘস্থায়িত্বের মধ্যে। ...অভ্যাসের দাসত্বের মধ্যে। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থার শক্তির মধ্যে।"

নির্বাচিত রচনাবলি - ৭ম খণ্ড

প্রকাশিত হল

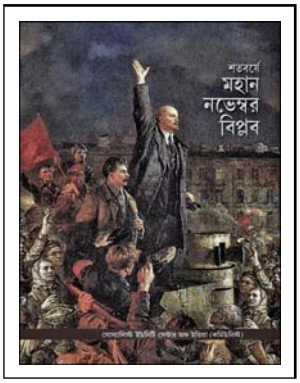

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য কমিটি প্রকাশনা
'শতবর্ষে মহান নভেম্বর বিপ্লব'
মূল্য ঃ দশ টাকা

'হিন্দু ঐক্যে'র ডাক কার বিরুদ্ধে? কী উদ্দেশ্যে?

আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত ব্রিগেডের সভায় হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। বলেছেন, হিন্দু সমাজের অগ্রগতির জন্য হিন্দুদের ঐক্য দরকার। শক্তি বাড়ানো দরকার। কিন্তু কেন? ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার তো কোনও কিছুর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করার জন্য। সেই শত্রু কে? ভাগবত বলেছেন, কারও বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের জন্যই এই ঐক্য দরকার। আর এস এস প্রধান কি সত্য বলছেন? কারও বিরুদ্ধে যখন তাঁরা নন, তখন সকল ভারতবাসীর ঐক্য বললেন না কেন? ঐক্য তো আরও মজবুত হত তাতে! আর এস এস স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিল এই যুক্তিতে যে, তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত। আসলে ভারতবাসীর ঐক্য তিনি চাননি। কারণ মুসলিম বিদ্বেষই যে তাঁদের পুঁজি। তাই মুসলিমদের বিরুদ্ধেই তাঁর এই ঐক্যের ডাক। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে তা উচ্চারণ করছেন না। তা হলে তাঁর আসল উদ্দেশ্যটিই ধরা পড়ে যায়।

বাস্তবে আজ হিন্দু সমাজ, মুসলিম সমাজ বা দলিত সমাজ বলে কোনও ঐক্যবদ্ধ সমাজ আছে নাকি? সমাজ আজ শোষক এবং শোষিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে বিভক্ত। এই বিভেদ ছাড়া যারা ধর্ম বর্ণ জাতের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করতে চায় তারা কি তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তা করছে? হিন্দু ঐক্যের কথা বলে, দলিত ঐক্যের কথা বলে, মুসলিম ঐক্যের কথা বলে বহু জনই নেতা হয়েছে, এমএলএ এমপি হয়েছে, মন্ত্রী হয়েছে, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতে সাধারণ হিন্দু মুসলিম বা দলিতদের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে? কোনও পরিবর্তনই আসেনি।

আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু ধর্ম নিয়ে বিভেদ তৈরির বিরুদ্ধে, মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে আখের গুছিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে, ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা লাগানোর বিরুদ্ধে। আর এস এসের হিন্দু ঐক্যের ডাক দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?

শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আজ সমস্ত ভারতবাসীর জীবনের মূল সমস্যা তথা অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, অশিক্ষা, চিকিৎসার সমস্যা, নীতি-নৈতিকতা এবং রুচি-সংস্কৃতির সংকট। হিন্দু মুসলমান বা অন্য কোনও ধর্মের সাথে যুক্ত মানুষের জীবনে এই সংকটের রূপ কি আলাদা? শিক্ষা চিকিৎসার বিপুল ব্যয়বৃদ্ধি সব ধর্মের মানুষের জীবনেই সংকট নামিয়ে এনেছে। রুচি-সংস্কৃতির সংকট, মহিলাদের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকা আক্রমণ আজ সব ধর্মের মানুষকেই সমানভাবে আঘাত করছে। এই সংকটগুলি যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? আর এস এস কি সমস্ত বেকারের

দুয়ের পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় নির্মাণ কর্মীদের সম্মেলন

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ঝজ্জর জেলা ভবন নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১০ জানুয়ারি। সমস্ত কর্মীদের নাম নথিভুক্ত করা, উপযুক্ত মজুরি, চিকিৎসা ভাতা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবিতে আহূত এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি কমরেড সত্যবান, এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়করণ, কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড রামফল প্রমুখ। সম্মেলনের শেষে কর্মীরা মিছিল করে গিয়ে সহকারী জেলাশাসকের হাতে দাবিপত্র পেশ করেন। সম্মেলন থেকে কমরেড বিনোদকুমার বেরি জেলা সভাপতি এবং কমরেড সঞ্জয় দুবলধন জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার কমছে

শিল্পপতিদের সংগঠন 'ন্যাসকম' সম্প্রতি বলেছে, ২০১৬ সালে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার কমেছে ১৩ শতাংশ। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের দুই অগ্রণী সংস্থা 'ইনফোসিস' ও 'উইপ্রো'-র তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার ফলে গভীর সংকটের মুখোমুখি তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প। এর জন্য বড় বড় শিল্পপতিরা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাইছেন না। ইনফোসিসের সিইও বলেছেন, কর্মীদের চাকরি বড় রকমের অনিশ্চয়তার মুখে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের প্রথম সারির আর এক সংস্থা টিসিএস-ও সংকটের কথা স্বীকার করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই ইনফোসিসের শেয়ার পড়তে শুরু করেছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

‘হিন্দু ঐক্যে’র ডাক কী উদ্দেশ্যে?

একের পাতার পর

কাজ, মহিলাদের উপর ক্রমাগত বেড়ে চলা নৃশংসতা বন্ধ করা, কর্পোরেট পুঁজির দেশজোড়া নির্বিচার শোষণ-লুণ্ঠন-দুর্নীতি রুখতে লড়তে চায়? না, এসব কথা ভাগবত একবারও উচ্চারণ করেননি। আর এস এসের লক্ষ্য জনজীবনের সমস্ত সংকটের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার মধ্য দিয়ে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। গত আড়াই বছরের বিজেপি শাসনে সমস্ত প্রতিশ্রুতিই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এ রাজ্যে বিজেপির সংগঠন গড়ে তুলতে এখন আর এস এসের সাম্প্রদায়িক জিগিরই একমাত্র পুঁজি।

আইসিস মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে খিলাফত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছে। তাদেরও লক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা। তার স্বরূপ আজ বিশ্বের মানুষের কাছে পরিষ্কার। আইসিসের মুসলিম ঐক্যের সাথে ভাগবতের হিন্দু ঐক্যের কোনও ফারাক আছে কি? এই ঐক্য কি সাধারণ হিন্দুদের মঙ্গলের লক্ষ্যে হতে পারে!

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত যে সমস্যাগুলি আজ মানুষের জীবনকে জর্জরিত করে তুলছে, তার হাত থেকে রক্ষার উপায় আজ আর কোনও ধর্মই দেখাতে পারে না, কোনও ধর্মগ্রন্থেই বেকার সমস্যা, শোষণের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, নারী নির্যাতনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে পুঁজিবাদ এই সমস্যাগুলির জন্ম দিয়েছে তার উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই একমাত্র এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব।

অথচ আর এস এস প্রধান সমস্ত সমস্যার মূল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। তিনি সমস্ত হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু হিন্দু শোষক পুঁজিপতি টাটা বিড়লা আম্বানি আদানি গোয়েঙ্কার সাথে শোষিত হিন্দু শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের ঐক্য কীভাবে সম্ভব? তিনি বলেননি, মুনাফার লোভে ছাঁটাই করা শ্রমিকের সঙ্গে ওই কারখানার কোটিপতি মালিকের ঐক্য কীভাবে সম্ভব। যে সার বীজ কীটনাশকের উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা কৃষকদের গলায় ফাঁস দিয়ে এসবের যথেচ্ছ দাম আদায় করছে তাদের সাথে ঋণ-জর্জরিত কৃষকদের ঐক্য কি শুধু হিন্দু বলেই সম্ভব? চিটফান্ডের হিন্দু মালিক এবং প্রতারিত হিন্দু আমানতকারীদের ঐক্যের কথাই কি বলেছেন ভাগবত? সে ঐক্য হলে তাকে কি সমর্থন করতে হবে? বাস্তবে তিনি যে হিন্দু ঐক্যের কথা বলেছেন তার দ্বারা দরিদ্র হিন্দুর শোষণমুক্তির সংগ্রামই দুর্বল হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন সমগ্র ভারতবাসী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শাসন থেকে মুক্ত হওয়াকেই সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে জেলে গিয়েছেন, অত্যাচার সহ্য করেছেন, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন, তখন আর এস এস সযত্নে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে, এমনকী ব্রিটিশকে সহায়তা করেছে। সেদিন সুভাষচন্দ্রের মতো নেতারা, যাঁরা শুধু ব্রিটিশ শাসন থেকেই নয়, সমস্ত রকমের শোষণ অত্যাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা আর এস এস রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং দেশবাসীকেও এই হীন রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। নেতাজি বলেছেন, “হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া ‘হিন্দুরাজ’-এর ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমজীবী জনসাধারণের, কৃষক ও শ্রমিকের স্বরাজ সর্বাধিক প্রয়োজন।” সে দিনের মতো আর এস এস আজও সেই অলস চিন্তারই চর্চা করে চলেছে। বাস্তবে স্বাধীন ভারতেও আর এস এস সব সময়ই শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে শাসক শ্রেণির পক্ষেই দাঁড়িয়েছে এবং শোষিত মানুষের স্বার্থকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যখনই শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তখনই আর এস এস তার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ডালি নিয়ে শাসকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের মানুষ দেখেছে, আর এস এস কীভাবে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছে, বাবরি মসজিদ-রামমন্দির রাজনীতিতে দেশজুড়ে এক বিরাট অংশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলেছে। আজও আর এস এস বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সমস্ত দিক থেকে মদত জুগিয়ে চলেছে। এ সম্পর্কেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেশের মানুষকে সতর্ক করেছিলেন— “প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা হিন্দু মহাসভার নামে রাজনীতিতে প্রবেশ করে তাকে কলুষিত করেছেন। ... সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশূল ও গৈরিক বসন দেখলে হিন্দুমাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে, ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই তার নিন্দা করা কর্তব্য। ... এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন, তাদের কথা কেউ শুনবেন না। আমরা চাই দেশের স্বাধীনতাপ্রেমী নরনারী একপ্রাণ হয়ে দেশের সেবা করুক।” এই একপ্রাণ হওয়ার ক্ষেত্রেই আর এস এসের মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এ কথা কে না জানে, আর এস এস যতই হিন্দু ঐক্যের কথা বলবে, মুসলিম মৌলবাদীরা, কায়েমি শক্তির প্রতিভূরা ততই মুসলিম ঐক্যের কথা তুলবে, খিস্টান ধর্মীয় কায়েমি স্বার্থবাদীরা খ্রিস্টান ঐক্যের কথা বলবে। আবার হিন্দু ধর্মের মধ্যেও উচ্চ বর্ণের ঐক্য, নিম্নবর্ণের ঐক্য, দলিত ঐক্যের জিগির উঠবে। অর্থাৎ শোষিত মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে রাখাই এই কায়েমি স্বার্থবাদীদের উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে নেতাজি বলেছেন, “হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক— ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হতে পারে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় তো কাকেও রেহাই দেয় না।”

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্পর্কে এই আধুনিক চিন্তার বিরোধিতা করেই আর এস এস হিন্দু রাষ্ট্রের স্লোগান তুলে চলেছে। দেশের জনগণকে আজ এ কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে যে, তার জীবনের যেগুলি মূল সমস্যা অর্থাৎ বেকারি মূল্যবৃদ্ধি নীতি-নৈতিকতার সমস্যা, তার যদি সমাধান করতে হয়, তবে তা আজ ধর্মের পথে হবে না, সাম্প্রদায়িকতার পথে হবে না, তীব্র শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তুলে পুঁজিবাদী এই সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদের মাধ্যমেই একমাত্র তা করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষের ঐক্য।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কমছে

একের পাতার পর

মাত্র কয়েক বছর আগের কথা স্মরণ করুন। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ব্যাপক কর্মস্থানের জোয়ার সৃষ্টি করবে, আই টি সেক্টরে বিশ্বের মধ্যে সাড়া ফেলে দেবে ভারত, এ সমস্ত বলে লাগাতার প্রচার চালিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা। পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন সিপিএম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সল্টলেককে তথ্যপ্রযুক্তি নগরী করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এ রাজ্যের যুবকদের। তেলেগু দেশম নেতা চন্দ্রবাবু নাইডুও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে ব্যবহার করে অন্ধ্রপ্রদেশকে দেশের মধ্যে এক নম্বর ‘হাইটেক সিটি’ বানানোর চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। হতাশ বেকার যুবকরাও অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চাকরির স্বপ্ন দেখতে থাকেন। সারা দেশে শিল্পনগরী, আইটি হাব করার জন্য পুঁজি ঢালতে শুরু করেন শিল্পপতিরা। এরপর ‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাট’-এর স্লোগানে চমকে দেওয়া হল দেশের মানুষকে। আজ সেই তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ফানুসও ফেটে যাচ্ছে।

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবচেয়ে বড় দু’টি বাজার ব্রিটেন ও আমেরিকা। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ব্রিটেনের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বাজার সাংঘাতিক রকম ধাক্কা খেয়েছে। তার প্রভাব পড়ছে ভারতের উপর। আর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়ে রেখেছেন, আমেরিকার বেকার সমস্যা মেটাতে মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে কর্মরত বিদেশিদের ‘অপ্রয়োজনীয়’ মনে করতে তিনি দ্বিধা করবেন না অর্থাৎ তাঁর স্পষ্ট কথা বেকার সমস্যা মেটানোর অজুহাতে সে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত ভারতীয়দেরও ছাঁটাই করতে তিনি দ্বিধা করবেন না। ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো দুটি বাজার অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র পড়েছে ঘোরতর সংকটে।

সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে বেকার সমস্যা আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আই এল ও) বলেছে, ২০১৭ সালে ভারতে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ৩.৪ মিলিয়ন বা ৩৪ লক্ষ। কর্মসংস্থান যখন নগণ্য, ছাঁটাই বেকারিতে জর্জরিত মানুষ, তখন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে উন্নয়নের মডেল হিসাবে সামনে এনে পুঁজিমালিকরা দেখাতে চেয়েছিল— কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র এখনও মজুত। পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বাজার সংকটে হাবুডুবু খেতে খেতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকেই খড়কুটোর মতো আকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছিল তারা। সে বুদবুদও ফেটে গেছে। যে রোগীর হাড়ে-মজ্জায় রোগ তার মাথায় ফেট্টি বেঁধে, ঝাড়ফুঁক করে যেমন রোগ সারানো যায় না, মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট তেমনই এক রোগ। এর মৃত্যু ছাড়া এ রোগের উপশমের কোনও পথ নেই। কখনও তথ্যপ্রযুক্তি, কখনও যুদ্ধ— এ সমস্ত দিয়ে আরও কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এ ব্যবস্থাকে চালানোর মরীয়া চেষ্টা পুঁজিমালিকরা করবেই। কিন্তু এ চেষ্টা বারবারই ব্যর্থ হবে।

জীবনাবসান

কলকাতার বেহালা আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক, শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড সমীরণ মিত্র ৪ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

কমরেড সমীরণ মিত্র বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকের একেবারে প্রথম দিকে চাকরির কারণে ঘাটশিলায় থাকাকালীন দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড হীরেন সরকারের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া দল এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি নিজেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত করেন।

কলকাতার বেহালা অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে পার্টির আদর্শে যে সব আন্দোলন গড়ে ওঠে, যেমন ধানকল মজদুরদের আন্দোলন, ট্রাম-বাস ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, রায়বাহাদুর রোড দিয়ে ১৪নং বাস চালু করার দাবিতে আন্দোলন ইত্যাদিতে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। বেহালায় প্রথম পার্টি সেন্টারের তিনি সদস্য ছিলেন।

ষাটের দশকে তিনি দলের বেহালা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। বয়স ও অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘকাল সক্রিয় ভূমিকা নিতে না পারলেও দলের ভালমন্দের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

তাঁর মরদেহ বেহালা পূর্বআঞ্চলিক অফিসে আনা হলে সেখানে জেলা কমিটির বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ, বেহালা পূর্ব আঞ্চলিক কমিটি সহ পার্শ্ববর্তী আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকগণ মাল্যদান করেন। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। ১৪ জানুয়ারি বেহালা গার্লস হাইস্কুলে তাঁর স্মরণে সভায় শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমিতা ব্যানার্জী। পূর্বতন জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড সমীরণ মিত্র লাল সেলাম

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার খাকুড়দহ অঞ্চলের দলের প্রবীণ সদস্য কমরেড নুর ইসলাম খাঁ (বড়দা) ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

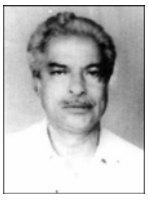

যৌবনে দলের সংস্পর্শে এসে এলাকার সংগঠনের কাজে নিজেকে যুক্ত করেন এবং সকল স্তরের মানুষের ভালবাসার পাত্রে পরিণত হন। কর্মজীবনে নদীয়া জেলাতে চাকরি করার সুবাদে বাস করেন এবং জেলা সংগঠনের কাজে যোগ দেন।

চাকরি জীবনের শেষদিকে নিজ জেলায় ফিরে নিজ এলাকায় সংগঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই এলাকার সকল স্তরের মানুষ, দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাসভবনে এসে শ্রদ্ধা জানান। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড পাঁচু নস্কর, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস নন্দ কুণ্ডু ও অজয় সাহা শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড নুর ইসলাম খাঁ লাল সেলাম

ব্রিটিশ শিক্ষকের দৃষ্টিতে নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া

(নভেম্বর বিপ্লব জারশাসিত রাশিয়ার অত্যাচারিত মানুষকে কীভাবে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল, রুশ দেশে শিক্ষকতা করার সুবাদে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তা তুলে ধরেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির গ্র্যাজুয়েট ও ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক প্যাট স্লোন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে তিন দফায় রাশিয়ায় গিয়ে তিনি থেকেছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার করা নানা ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে ১৯৩৮ সালে তিনি 'রাশিয়া উইদাউট ইলিউশন' বইটি লেখেন। ১৯৪৫ সালে সেটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'বিপ্লবোত্তর রাশিয়া' নামে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্রের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্যাট স্লোন দেখিয়েছেন, এবং সমাজতন্ত্রের অধীনে রুশ জনগণের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তার সামান্য অংশ আমরা পুনর্মুদ্রিত করছি। বর্তমানে কমিউনিস্ট ও স্ট্যালিনবিরোধী মিথ্যা প্রচারের মুখোশ খুলতে রচনাংশটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করি।)

সোভিয়েত স্বাধীনতার মূল কথা

১৯৩৫ সালে রয় হাওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে স্ট্যালিন নানা কথার মধ্যে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"একজন অভুক্ত চাকরিহীন বেকার যে কী ধরনের ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করার আশা করে তা আমি ভেবে পাই না। শোষণ যেখানে লোপ পেয়েছে, যেখানে একের উপর অন্যের পীড়নের প্রশ্ন নেই, যেখানে নেই দারিদ্র ও বেকারত্বের প্রশ্ন, যেখানে কোনও লোক আগামীকাল রুটি, ঘর বা কাজ হারাবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত নয়, সেখানেই প্রকৃত স্বাধীনতা হতে পারে। শুধু সে সমাজেই প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্ভব।"

উপরোক্ত কথাগুলিই হচ্ছে সোভিয়েট স্বাধীনতার মূল কথা। ...

সমস্ত মজুর শ্রেণির কারখানা পরিচালনার দাবি ও কৃষকের জমির স্বত্ব দাবির ফলেই এই সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তন সম্ভব হয়েছে। এবং এই নতুন পদ্ধতির আওতায় কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে ও গ্রাম্য শাসনব্যবস্থায় কৃষকদের প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়ার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণি দেখতে পাচ্ছে যে তাদের স্বাধীনতার দাবির মধ্য দিয়ে তারা এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছে যাতে কি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, কি শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে তারা স্বপ্নাতীত সুখ বা আনন্দের অধিকারী হতে পেরেছে। ...

রাশিয়ার পূর্বতন শাসনকর্তাদের কাছে এই অভিনব সামাজিক পদ্ধতি একেবারেই অবাঞ্ছনীয় ছিল।....

সোভিয়েট ইউনিয়নে দেখেছি যে অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়কে বিজ্ঞান হিসাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের চিন্তার খোরাক জোগানো এবং বিরুদ্ধ মতামতের এলোমেলো চিন্তা থেকে রেহাই দেওয়া। কারণ এসব তত্ত্ব পুঁজিবাদকে মূল ভিত্তি বলে ধরে নিয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের কাছে অর্থনীতি ও মানব ইতিহাসের চিন্তাধারা মূল চিত্রকে প্রকটিত করে। মানুষের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বোধের সৃষ্টি করাও হল এর অন্যতম লক্ষ্য। কেমব্রিজে অর্থনীতিতে হাত পাকিয়ে ও উত্তর ওয়েলসে দু'বছর ধরে সে সব শিক্ষা দিয়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, মস্কোয় প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব-সমস্যাকে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করার উপযোগী পাঠ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। সেখানে আরও দেখতে পাই যে, যে সব বই অবলম্বন করে এই উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, আমাদের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় সেগুলোর কোনও উল্লেখই নেই।...

ব্রিটেনে একজন মার্কসপন্থীর অর্থনীতির অধ্যাপক হওয়ার মতোই মস্কোয় একজন মার্কসবিরোধীর অর্থনীতির অধ্যাপক হওয়া একটা কঠিন ব্যাপার। তেমন জার্মানি ও ভারতবর্ষে দু'টি পদ্ধতিই পাশাপাশি নিজস্ব নীতি বজায় রেখে কাজ করছে, এটাও একটা অভাবনীয় ব্যাপার। যদি আমরা সোভিয়েটের অর্থনীতিকে বৈজ্ঞানিক ও আমাদেরটা অবৈজ্ঞানিক বলে মেনে নিই, তবে স্বীকার করতে হবে যে সোভিয়েটে অর্থনীতি বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। সে জায়গায় এদেশের মানসিক চিন্তাবৃত্তিগুলো অবৈজ্ঞানিক সুড়ঙ্গ পথে হাঁপিয়ে মরে। সত্যকে খুঁজে নেওয়ার স্বাধীনতা ইংল্যান্ড থেকে সোভিয়েটে ঢের বেশি। ...

কাজেই এটা স্বাধীনতা বনাম স্বাধীনতা দমনের প্রশ্ন নয়। এ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের স্বাধীনতার মধ্যে থেকে একরকম স্বাধীনতা বেছে নেওয়ার প্রশ্ন। আমার মতোই যদি আপনারা মার্শেলের ও মার্কসের অর্থনীতির আপেক্ষিক তুলনায় সক্ষম হয়ে থাকেন এবং এই ধারণায় এসে থাকেন যে মার্কসের অর্থনীতিই হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর যুগ থেকে ভুল বা অবৈজ্ঞানিক পথে পাক খেয়ে খেয়ে নিজের চারপাশে একটা পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি করেছে — তবে নিজেদের শিক্ষাপদ্ধতিকে নিন্দা ও সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। আবার কেউ যদি মনে করে যে আমাদের অর্থনীতিবিদদের মতামতসমূহ বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদীর মতামত অবৈজ্ঞানিক, তবে এখানকার পদ্ধতিই আপনি পছন্দ করবেন। কিন্তু যে যাই ভাবুন কেউ যেন কল্পনাও না করেন যে কোনও মার্কসপন্থীর অবাধে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির সর্বোচ্চ পদ অধিকার করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সেটা সোভিয়েটেও নেই। কারণ আজ পর্যন্ত এরূপ স্বাধীনতা কোথাও দেখা যায়নি।...

মার্কসীয় চিন্তাধারাই একমাত্র খাঁটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, এই মত প্রসারের ফলে যদি জনমতের চাপে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশ্নে তাদের মতামত বদলাতে বাধ্য হয় এবং উচ্চপদে মার্কসপন্থীরা উন্নীত হয় তাহলে মার্কসবিরোধীদের সরিয়ে সে জায়গায় মার্কসপন্থীদের নিয়োগ করলে সোভিয়েটের মতো এখানেও একই ধরনের অভিযোগ চলতে থাকবে। তারা তখন স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত বলেই অভিযোগ করতে থাকবে। আমি সোভিয়েটে একবার ইতিহাসের ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম। তাকে আমি এক কথায় বলতে পারি অপূর্ব। অথচ সেই ক্লাসের বক্তা একজন খেতাবধারী অধ্যাপক নন, একজন সাধারণ শিক্ষক মাত্র। তাঁর বলার কৃতিত্ব তাঁর ব্যক্তিত্বের ফলে নয়, সেটা হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির গুণ। কৃতিত্বপূর্ণ উপায়ে মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস প্রকাশের স্বাধীনতা উপভোগকারী সোভিয়েট যুবকদের আমি ঈর্ষা করি। আমাদের ছাত্রেরা এই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। কারণ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের মতো মার্কসীয় দার্শনিকেরাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অপাংক্তেয়। ইতিহাসের বেলায়ও এটা পুরোপুরি প্রযোজ্য। ...

সময়ে সময়ে আমাকে লেখকরা জিজ্ঞাসা করেন যে, "ধরুন, আমি যদি আজ সোভিয়েটে বাস করে কোনও বই লিখি এবং যে কোনও কারণে হোক সেটা যদি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পায় তবে আমি সেটা প্রকাশ করতে পারব কি?" স্পষ্টই উত্তর দিয়ে থাকি — "না"। কারণ আজকে সোভিয়েট রাশিয়ায় বই প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের, ট্রেড ইউনিয়নের, কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য গণ প্রতিষ্ঠানের। সোভিয়েট জাতি গড়ে তোলার জন্য এ সব সংঘ সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু এ সব প্রকাশনালয় হচ্ছে গণপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত নয়, কাজেই তারা ব্যক্তিগত মুনাফার খাতিরে নয়, জনস্বার্থের ভিত্তিতেই এ সব বইয়ের বিচার করে, বিবেচনা করে। কাজেই তারা জনস্বার্থের উপযোগী বইই শুধু ছাপায়, অন্য বই নয়। শেক্সপীয়র ও টলস্টয়ের বই হাজারে হাজারে ছাপানো হয় তবে সস্তা দরের চটকদার বই আদৌ ছাপানো হয় না। সবাই স্বীকার করবে যে, এ হচ্ছে সোভিয়েট পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা। এতে নিশ্চয়ই কেউ অমত করবে না। লেনিন ও স্ট্যালিনের লেখা বই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। তাই বলে হিটলার বা ট্রটস্কির লেখা মোটেই ছাপানো হয় না। রাজনৈতিক মতবাদ অনুসারে এটা অনেকে ভাল বা খারাপ বলবে। ...

ধনতন্ত্রের আওতায় প্রকাশনালয় চলে মুনাফার খাতিরে। প্রকাশকদের সেখানে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে বই কাটতির দিকেই প্রবল ঝোঁক। ফলে সোভিয়েটের মতো সমাজসেবার প্রেরণা নিয়ে সেখানে প্রকাশনালয় পরিচালিত হয় না। কাজেই মুনাফালোভী প্রকাশকের কর্তৃত্ব, না জাতির সংস্কৃতির মান উন্নতকারী জনপ্রতিনিধিদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

লেনিন বন্দনা

নির্মলেন্দু গুণ

মানবের বাসযোগ্য পৃথিবী ছিল না পৃথিবীতে।
অথচ মানুষ ছিল, ছিল উর্বর মৃত্তিকা,
ছিল পাহাড়, অরণ্য, নদী, সীমাহীন সমুদ্র, আকাশ।
ছিল ধর্ম, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস।
তবু মানবের বাসযোগ্য পৃথিবী ছিল না পৃথিবীতে।
ছিল দানব দাপটে কম্পমান এক মানব সমাজ,
যেন মরুদ্যানহীন কোনও মরু।

মহামানবেরা এসেছেন দল বেঁধে মানুষের মুক্তিবাণী নিয়ে।
তাঁরা বলেছেন ঃ 'ভালবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
তাতেই কল্যাণ, শান্তি।

আমরা তাদের কথা মেনেছি মন্ত্রের মতো।
তাই ভালবেসে ঝুড়ে, জলে কর্ষণ করেছি ভূমি,
বুনেছি স্বপ্নের বীজ, ফলেছে ফসল।
নিয়ে গেছে ভূস্বামীর দল। দেখেছি চুপটি করে।
আমার ক্ষুধার কথা ক্ষণিকের তরে স্মরণে রাখেনি কেউ।

ভালবেসে ভাঙিয়া পর্বত নির্মাণ করেছি পথ অহোরাত্র শ্রমে,
সভ্যতা বেড়েছে ক্রমে ক্রমে। সে পথে আসেনি মুক্তি।
পরদিন তৈরি পথ ধরে আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে
এসে শোষকের রথ, কেড়ে নিতে শেষ শস্যকণা। যখন বলেছি ঃ
'প্রভু অনেক দিয়েছি আর তোমাকে দেব না।'
তখনই তাদের হাতে ঝলসে উঠেছে অস্ত্র, যেন ক্রুদ্ধ
দংশন উদ্যত শত নাগিনীর ফণা ঘিরেছে আমাকে অসহায়।

নিরুপায় অনাথের অশ্রুসিক্ত চোখে পাথরে কুটেছি মাথা।
প্রতিকারে অপারগ যে নিষ্ঠুর প্রাণের দেবতা সুচতুর ছলনায়
ফিরিয়ে রেখেছে মুখ, তাকেও বেসেছি ভালো।
তারপর বিশ্বাসে পড়েছে ভাটা, ভেতরে জমেছে ঘৃণা,
নতুন জীবন স্বপ্ন কুঁড়ি মেলে ফুটেছে হৃদয়ে।
তাই সত্য কি না, সে কথা জানার আগে
কত প্রিয় সময় ফুরাল পৃথিবীর।
তারপর তুমি এলে।

সেটা কোন সাল?
হোক না তা যে কোনও বছর, এই যে বিগত মহাকাল
আছে অনাগত কালে মুখ গুঁজে, তার পিঠে, চাবুকের
ক্ষত দগ্ধ পুঁজে তুমি এসে ভালোবেসে করেছ চুম্বন।
ওটাই স্মরণে থাক মানুষের।

কোথায় তোমার জন্ম?
হোক না তা সিমবির্স্ক কিংবা কোনও ভলগার তীরে,
তোমার জন্মের অর্থ বদলে দিয়েছে এই জরাজীর্ণ
দীর্ণ পৃথিবীরে, ওটাই স্মরণে থাক মানুষের।

ব্যক্তি বিশেষের স্তুতি অর্থহীন তোমার দৃষ্টিতে।
জানি, তোমার বিশ্বাস অমোঘ সত্যের মতো
ধাবমান মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে।
দানবিক গ্রন্থিজাল ছিন্ন করে মানবকল্যাণ স্বপ্ন
রহিয়াছো তুমি, পুরাতন পৃথিবী 'পরে
সৃজিয়াছো নববিশ্ব মানবের বাসযোগ্য করে।

মার্কসের দ্বান্দ্বিক দর্শন যে সত্য ধারণ করে
আপনার মাঝে ছিল আত্মলীন তত্ত্বের আকারে
তুমি তার শ্যামল স্বপ্নের পদতলে বিছিয়ে দিয়েছ
এনে পৃথিবীর অকর্ষিত মাটি।
মরুতে ফুটেছে পদ্ম, তুমি তার জীবন্ত মৃণাল।
হোক না তা দূরে কোনও ভলগার তীরে,
তোমার বিপ্লববাণ বদলে দিয়েছে জানি
অন্যায় আকীর্ণ পৃথিবীরে।
ওটাই স্মরণে থাক মানুষের।

আমি অতি হীনমতি বাংলার বিপন্ন চারণ,
তোমাকে স্মরণ করে রক্তের অক্ষরে লিখি
তোমার প্রশস্তি গাথা। যেমন প্রশস্তি গাই
হেমন্তের চাঁদে ধোয়া নীল আকাশের,
যেমন প্রশস্তি গাই রাত্রি শেষে রক্তিম সূর্যের;
তেমনি তোমার নাম ভালবেসে লিখি প্রতিদিন ঃ
ভলাদিমির ইলিচ লেনিন।

বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে দাদা খুন
এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

নদীয়া জেলার দেবগ্রামে ১২ জানুয়ারি রাতে দুই বোনকে স্কুটিতে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দাদা গোলাম মোর্তাজা। সেই সময় তিন যুবক বাইক নিয়ে তাঁদের উপর চড়াও হয়, অশালীন আচরণে উত্যক্ত করতে থাকে। বোনেদের রক্ষা করতে দ্রুত গতিতে স্কুটি চালালে দুষ্কৃতীরা স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন গোলাম মোর্তাজা, দুই বোনও গুরুতর আহত হন।

এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ১৪ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দেবগ্রাম লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে দেবগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন দলের নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস বসির আহমেদ, হররোজ আলি সেখ, মহিউদ্দিন মণ্ডল ও আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দিন সেখ। দুষ্কৃতীদের কঠোরশাস্তি, মদের ঠেক বন্ধ এবং নাগরিক সুরক্ষার দাবিগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন ওই অফিসার।

ওড়িশায় কৃষক বিক্ষোভ

গ্রামীণ জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে ৭ জানুয়ারি ওড়িশার কেওনঝরের পাটানা বিডিও অফিসে প্রবল বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষ। অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস এবং কমরেডস প্রকাশ মল্লিক, বেণুধর সর্দার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের পাটানা ব্লকের সভাপতি কমরেড ঘনশ্যাম মহান্ত। পরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত দাবিপত্র বিডিও-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিহারে ছাত্রী হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

হাজীপুরের আম্বেদকর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে এক দলিত ছাত্রীকে গণধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে ১০ জানুয়ারি বিহার রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে এ আই ডি ওয়াই, এ আই ডি এস ও এবং এ আই এম এস এস-এর যৌথ উদ্যোগে মতিঝিলে এক বিরাট মিছিল পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে কল্যাণী চকে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় যুব-ছাত্র-মহিলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

পাশ-ফেল চালুর দাবিতে কৃষ্ণনগরে অবস্থান

২০১৭ শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি নদীয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। অবস্থান চলাকালীন জেলা সভাপতি সদানন্দ কর্মকার, সম্পাদক হররোজ আলি সেখ সহ পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য গেলে, জেলাশাসকের প্রতিনিধি হিসাবে সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা প্রজেক্ট অফিসার স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে পাশ-ফেল চালু সহ উত্থাপিত ৬ দফা দাবির সঙ্গে তিনি সহমত পোষণ করেন। শিক্ষার বেসরকারিকরণের লক্ষ্যেই যে পাশ-ফেল প্রথার বিলোপ, সে বিষয়ে অবস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষকর জয়দেব মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী, বিমান কর্মকার, কুমুদরঞ্জন দাস, অরুণকুমার চক্রবর্তী, সমীরকুমার বিশ্বাস, মোসলেম গাজী প্রমুখ।

ফি প্রত্যাহারের দাবিতে বর্ধমানে ডি এস ও-র আন্দোলনের জয়

লাউদোহা কে টি বি উচ্চ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ভর্তি ফি নেওয়ার প্রতিবাদে ২ জানুয়ারি ডি এস ও-

র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও কথাই শুনতে রাজি হয়নি। ফলে ৪ জানুয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সংগঠিত করে পুনরায় প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারিকে ঘেরাও করা হয়। আন্দোলনের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি ৭০ টাকা মকুব করে এবং দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফি মকুব করা হবে বলে আশ্বাস দেয়। লাউদোহার সমস্ত স্কুলে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তির দাবিতে ৭ জানুয়ারি এ আই ডি এস ও অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বি ডি ও অফিসে ডেপুটেশন দেয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের লাউদোহা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেডস সোমেশ রুইদাস, অরিজিৎ চ্যাটার্জী সহ আরও অনেকে।

মদবিরোধী কনভেনশন

কলকাতা ঃ কলকাতায় ঠাকুরপুকুর-কলাগাছিয়া অঞ্চলের মহিলাদের সংগঠিত করে কলাগাছিয়া হাই স্কুলে ৭ জানুয়ারি মদবিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের আগে এ আই এম এস এস-এর সরশুনা আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে এলাকায় ব্যাপক প্রচার ও মিটিং করা হয়। কনভেনশনে দেড় শতাধিক মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড রুণা পুরকাইত ও জেলা কমিটির পক্ষে কমরেডস কবিতা মান্না ও মানসী রায় উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশন থেকে একটি গণকমিটি গঠন করা হয়। পরে একটি মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সাঁওতালডি ঃ মদের ভাটি বন্ধের দাবিতে ১২ জানুয়ারি পুরুলিয়ার সাঁওতালডির কামারগোড়া মোড়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। দাবি ওঠে কদমদহ ব্রিজের কাছে মদের ভাটি বন্ধ করতে হবে, মদ বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এই দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কনভেনশন থেকে গণকমিটি গঠিত হয়।

আগরতলায় ছাত্রদের স্টাডিক্লাস

ত্রিপুরার আগরতলা জেলার ছাত্রকর্মীদের নিয়ে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে ৩ জানুয়ারি একটি স্টাডিক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'ছাত্র ও যুবসমাজের কর্তব্য' বই থেকে উত্থাপিত নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড গোপাল সাহু।

বিহারে বিক্ষোভ মিছিল

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ফিক্সড ডিপোজিটে সুদ কমানো ও অসংখ্য ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধের প্রতিবাদে এবং বেকারদের কাজ, বন্ধ শিল্পগুলি খোলার দাবিতে ৮ জানুয়ারি মুঙ্গেরে এস ইউ সি আই (সি) এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়।

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে বোলাঙ্গিরে বালি-ভাস্কর্য প্রদর্শনী

নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপনে ওড়িশার বোলাঙ্গিরে সৃষ্টিশীল উদ্যোগ নিয়েছে এস ইউ সি আই (সি) বোলাঙ্গির আঞ্চলিক কমিটি। ১২-১৫ জানুয়ারি গণসাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে আকর্ষণীয় বালি-ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই ভাস্কর্যগুলির শিল্পীদলের প্রধান বোলাঙ্গির লোকাল অরগানাইজিং কমিটির সম্পাদক কমরেড ওমপ্রকাশ সাহু। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের একটি বালি-ভাস্কর্যও এই প্রদর্শনীতে ছিল, ছিল উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ও বুক স্টল। শত শত মানুষ প্রদর্শনীটির প্রশংসা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এ আই ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র।

আইসিসকে অস্ত্র জোগাচ্ছে খোদ আমেরিকা

বিশ্বকে নাকি সন্ত্রাসবাদ মুক্ত করতে চায় আমেরিকা! আপাতত তার প্রধান শত্রু ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইসিস। তাদের নিকেশের লক্ষ্যেই তো মার্কিন-ব্রিটিশ আক্রমণে বিধ্বস্ত ইরাকের উপর নতুন করে সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বিমান থেকে বোমা ফেলে দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। রক্তের বন্যায় ভিজিয়ে দিয়েছে সিরিয়ার মাটি। ছারখার করে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। অথচ আইসিস সন্ত্রাসীদের হাতে হাতেই ঘুরতে দেখা যাচ্ছে খোদ আমেরিকা থেকে রপ্তানি করা বোমা, বন্দুক সহ বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র! হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও এই সত্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বিবিসি নিউজের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদমাধ্যমে!

সম্প্রতি জেমস বেভানের নেতৃত্বে 'কনফ্লিক্ট আর্মামেন্ট রিসার্চ' বা সিএআর-এর একটি তদন্তকারী টিম ইরাকে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিতে হানা দিয়ে আমেরিকা ও সৌদি আরবের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন। ছবি সহ এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ২১ নভেম্বরের বিবিসি নিউজে।

ইরাকের কারাকশ শহরে আইসিস সন্ত্রাসীদের একটি আস্তানায় সম্প্রতি হানা দিয়েছিলেন সিএআর-এর তদন্তকারীরা। মাত্র মাসখানেক আগে এই শহর থেকে সন্ত্রাসীদের হঠিয়েছে ইরাকি সেনা। রক্তের দাগ লাগা সদর পার হয়ে বাড়িটির ঘরে ঘরে ছড়িয়ে থাকা আইসিস সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত বিছানাপত্র, জামাকাপড়, আত্মঘাতী হানার জন্য ব্যবহার্য পোশাক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পথ করে গিয়ে পিছন দিকের একটি ঘরে তাঁরা দেখতে পান অস্ত্রশস্ত্রের অনেকগুলি খালি বাক্স। এগুলির খোঁজেই ছিলেন তাঁরা। কেন না বাক্সের গায়ে ছাপা সিরিয়াল নম্বর ও ব্যাচ নম্বরের সূত্র ধরে কম্পিউটারে রক্ষিত ডেটাবেসের সাহায্যে সহজেই খুঁজে নেওয়া যায় কোন দেশের কোন কারখানায় অস্ত্রগুলি তৈরি করা হয়েছে। তাঁদের তদন্তের উদ্দেশ্যই ছিল এগুলি খুঁজে বের করা।

এরপর তাঁরা তদন্তের সূত্র ধরে হানা দিয়েছেন স্থানীয় একটি গির্জায়। দেখা গেছে, গির্জার হলঘরটিতে আইসিস সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের ছোটখাট কারখানা বানিয়েছিল। তদন্তকারীরা দেখেছেন, মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রকেটের নানা অংশ, পাত্র ভর্তি রাসায়নিক, বিস্ফোরক বানানোর হাতে লেখা পদ্ধতি ইত্যাদি। ঘরোয়া পদ্ধতিতে মর্টার তৈরির পাশাপাশি অস্ত্র তৈরিতে সন্ত্রাসীরা যে বিদেশ থেকে নিয়মিত সাহায্য পেয়েছে, তদন্তকারীরা তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন, গির্জায় বসার জায়গাগুলি বোঝাই রয়েছে বিস্ফোরক তৈরির রাসায়নিকে। তুরস্কের বাজার থেকে কেনা এইসব রাসায়নিক ব্যাপক পরিমাণে আইসিস সন্ত্রাসীদের হাতে এসেছে। বোঝা যায়, এইসব পণ্যের বড় বড় বিক্রেতাদের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তদন্তকারীরা দেখেছেন, একই লট নম্বর যুক্ত তিন থেকে পাঁচ হাজার বস্তা রাসায়নিক রয়েছে সন্ত্রাসীদের দখলে। অর্থাৎ একটা কারখানার মোট উৎপাদনের অর্ধেকটাই একসঙ্গে চলে এসেছে আইসিসের হাতে। তদন্ত করে জেমস বেভান জানিয়েছেন, অস্ত্রশস্ত্র ও তার উপকরণের উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে এবং এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, বড় বড় সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে আইসিসের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসার জগতটি আলো-আঁধারিতে ঢাকা। সেই ধোঁয়াশা ভেদ করে সন্ত্রাসীদের হাতে আসা বিপুল অস্ত্রের উৎস সন্ধান করেছেন জেমস বেভান। বাক্সের গায়ে ছাপা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এসব তৈরি হয়েছে পূর্ব ইউরোপের কারখানায়। উৎপাদক দেশের সরকারগুলির সাহায্য নিয়ে তদন্তকারী টিম খুঁজে বের করেছে, কাদের কাছে এগুলি বিক্রি করা হয়েছে তার তথ্য। দেখা গেছে, এসব অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা হয়েছে আমেরিকা ও সৌদি আরবে। বিক্রি হওয়ার পর তুরস্কের মধ্য দিয়ে সেসব পাঠানো হয় সিরিয়ায়। উদ্দেশ্য, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে আসাদ সরকারকে উচ্ছেদ করে সেখানে পুতুল সরকার বসাতে চায় এ কথা আজ সকলেরই জানা। আসাদবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে তৈরি করা এবং তাদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার কাজ আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে। সৌদি আরবও সেই কাজে আমেরিকার সহায়। বেভান দেখিয়েছেন, সিরিয়ায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির জন্য পাঠানো এইসব অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রোপকরণ মাঝ রাস্তায় আইসিস সন্ত্রাসীদের হাতে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর আগেও বিমান থেকে আইসিস সন্ত্রাসীদের জন্য অস্ত্র নামিয়ে দিতে গিয়ে ইরাকি সেনার হাতে একাধিকবার ধরা পড়েছে মার্কিন যুদ্ধবিমান। পশ্চিমী সংবাদমাধ্যম এ সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ইরাকের সংবাদপত্রে ঘটনার বিবরণ ছবি সহ প্রকাশিত হয়েছে।

এই হল মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে স্বঘোষিত 'ক্রুসেডার' সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আসল চেহারা। একদিকে অর্থ ও অস্ত্রের ঢালাও জোগান দিয়ে মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে পুষ্ট করা, অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাম করে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে সেখানকার সম্পদ লুঠ করার পাশাপাশি অস্ত্রশস্ত্রের ঢালাও কারবার চালানো যাতে করে মরতে বসা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই যুগে অর্থনীতির সংকট কিছুটা কাটানো যায়।

প্রতিবেদক দেখিয়েছেন, এ ঘটনা নতুন নয়। অতীতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সমর্থক গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে পদক্ষেপ করতে চাওয়া সরকারের বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে অস্ত্র সাহায্য করতে গিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এভাবেই ওসামা বিন লাদেনের মতো মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের বাড়বাড়ন্তে মদত দিয়েছে। উপসংহারে বিবিসি নিউজের প্রতিবেদক গর্ডন কোরেরা মন্তব্য করেছেন, বিদেশি রাষ্ট্রগুলি যতদিন অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সরকারবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে এভাবে সাহায্য করতে থাকবে ততদিন অস্ত্রশস্ত্রের এই প্রবাহ বন্ধ করা যাবে না। বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার স্যাঙাৎ দেশগুলি তা চায়ও না। মুমূর্ষু পুঁজিবাদের এই যুগে বিশ্বের সমস্ত দেশের মতোই আমেরিকাও ধুঁকছে ভয়ঙ্কর বাজার সংকটে। বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু কেনার ক্ষমতা নেই বেকারি, ছাঁটাই, কম মজুরির ফাঁসে ছটফট করতে থাকা সাধারণ মানুষের। এই অবস্থায় অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় ব্যাপক সামরিকীকরণ— এক কথায় অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন ও বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া। দেশে দেশে খোদ সরকারগুলিই এইসব অস্ত্রশস্ত্রের ক্রেতা। মানুষ মারার এই ব্যবসা চাঙ্গা রাখতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি আজ দেশে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে, মদত দিচ্ছে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা-হাঙ্গামায়। আইসিস সহ সমস্ত মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে নানা ভাবে মদত দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে এরাই। সিএআর-এর তদন্তকারী টিম এই সত্যই আবার সামনে এনে দিল।

ঝাড়খণ্ডে প্রেমচন্দ-শরৎচন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান

ভারতীয় নবজাগরণের আপসহীন ধারার বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেমচন্দ ও শরৎচন্দ্র স্মরণে লোক সাংস্কৃতিক চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে ২ জানুয়ারি জামসেদপুরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ সুভাষচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ জি এম শরণ, প্রভাত খবরের সম্পাদক রণজিৎ সিংহ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন নন্দকুমার উম্মান, সঞ্চালক ছিলেন সুমিত রায়। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, নোটবাতিল বিরোধী নাটক ইত্যাদি পরিবেশিত হয়।

নেতাজি স্মরণে

এ বছর ২৩ জানুয়ারি স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৯তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে তাঁর কিছু স্মরণীয় উক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করে প্রকাশ করা হল।

সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে

- *"আমার ছেলেবেলায় আমি ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই সব চাইতে বড় কর্তব্য বলে মনে করতাম। পরে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, ব্রিটিশকে তাড়ালেই আমার কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থা চালু করার জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে।"*– **(বিপ্লব কী)**
- *"বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অসংখ্য স্রোত ও প্রতিস্রোতকে দুটি প্রধান বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিপরীত স্রোতে ধাবমান কমিউনিজমের শক্তিগুলি। সেইজন্যই হিটলারের অবসানের অর্থ কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা।"***(পুরুলিয়া সংবর্ধনা সভায় ভাষণ, ১২ নভেম্বর, ১৯৩৯)**
- *"আজকের যুগে যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, তারা কমিউনিজম ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকৃত্রিম বন্ধু ও নির্ভরশীল শক্তি গণ্য করবে।"*– **(রচনাবলি - ৫)**
- *"উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি মার্কসবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। আর বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারা রাষ্ট্র ও সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।"***(ভারতের মুক্তি সংগ্রাম)**
- *"আজ যদি ইউরোপে এমন কোনও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন, যাঁহার হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যস্ত, তবে তিনি হইলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করে না করে, তাহার দিকে সর্বাধিক উদ্বেগ লইয়া গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকাইয়া থাকিবে।"*– **(রচনাবলি -৬)**
- *"পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিকরা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে, রাশিয়ায় পুরোপুরি শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে ধনতন্ত্রবাদীদের অস্তিত্ব নাই, ... ভারতও সেই পথে যাইবে না কেন, তাহার কোনও কারণ নেই।"*

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে

- *"হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দুরাজ'-এর ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমজীবী জনসাধারণের, কৃষক ও শ্রমিকের স্বরাজ সর্বাধিক প্রয়োজন।"*– **(সুভাষ রচনাবলি)**
- *"প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা হিন্দু মহাসভার নামে রাজনীতিতে প্রবেশ করে তাকে কলুষিত করেছেন।... সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশূল ও গৈরিক বসন দেখলে হিন্দুমাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে, ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই তার নিন্দা করা কর্তব্য।... এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন, তাদের কথা কেউ শুনবেন না। আমরা চাই দেশের স্বাধীনতাপ্রেমী নরনারী একপ্রাণ হয়ে দেশের সেবা করুক।"*– **(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.৫.১৯৪০)**
- *"দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ক্যানসার নির্মূল করা ... বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু এই কাজই অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি একটিবার আমরা সমগ্র জাতিকে জড়িয়ে বিপ্লবী মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে পারি।"*

নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া

তিনের পাতার পর

কর্তৃত্ব, এই দু'টির একটিকে বেছে নিতে হবে। ...

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বা পুঁজিবাদের যখনই কোনও সংকট দেখা যায় তখনই এমনকী ব্যক্তিগত প্রকাশনালয়গুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে পড়ে। যদি আমরা ব্রিটেনের কুৎসা প্রচার আইন, দেব নিন্দা আইন, সরকারি গুপ্ত আইন অথবা সরকারি অনুমতি ব্যতীত প্রকাশিতব্য নয় — এ ধরনের আইনের কথা ধরি তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে আমাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। জরুরি অবস্থায় স্বাধীনতার তো কোনও কথাই আসে না। যদি আমরা চল্লিশ কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষের কথা ধরি তবে দেখতে পাব, ব্রিটিশ আইনের দৌলতে বহু বামপন্থী প্রকাশনালয়ের বই ভারতবর্ষে পাঠানো নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ স্বাধীনতা সমগ্রভাবেও সোভিয়েট স্বাধীনতার চেয়ে মোটেই প্রশস্ত নয়। শিক্ষা সংক্রান্ত স্বাধীনতার কথা যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। কে এই স্বাধীনতা নির্ধারণ করবে এবং কাদের স্বার্থের খাতিরে করবে? উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা রাষ্ট্রের বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃত স্বাধীনতাকামীর প্রশ্ন হবে, একটি পরাধীন দেশে বা যুদ্ধরত দেশে শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা প্রত্যেক লোককে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে উন্নত হবার বেশি সুযোগ দেবে — সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর সোভিয়েটে বর্তমানে যে জরুরি অবস্থা, যুদ্ধাবস্থা চলছে এটাও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে যার জন্য সোভিয়েটকে কতক ব্যবস্থা নিজের হাতে নিতে হয়েছে।...

ধর্মের স্বাধীনতা

এদেশে একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, সোভিয়েটে ধর্মের স্বাধীনতা নেই। কোনও সত্য নেই এ কথার পিছনে। অবশ্য এটা ঠিক যে অন্যান্য দেশের গির্জার তুলনায় রাশিয়ার গির্জাগুলো কিছুটা আর্থিক দুরবস্থা ভোগ করে। কারণ তারা এখন জমি বা মূলধনের মুনাফা ভোগ করতে পারে না। বর্তমানে বস্তির ভাড়া থেকে বঞ্চিত হলে ইংল্যান্ডের গির্জাগুলোও নিঃসন্দেহে দারুণ দুরবস্থায় পড়বে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বক্তব্য হল, কেন আমরা দলে দলে ছেলেমেয়েদের যথেচ্ছ ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট বা গোঁড়া রাশিয়ান হতে দেব? আমরা ধর্ম সম্বন্ধে নিরীশ্বরবাদী। আমরা এদের কাউকে আমল দিই না। তাই পারিবারিক গণ্ডির বাইরে এসব ছেলেমেয়েকে ধর্মবুদ্ধি প্রণোদিত করা নিষিদ্ধ। এ সব ছেলেমেয়েরা কিছুটা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই, তারা ইচ্ছা করলে গির্জায় যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু নিজেদের বিচার-বুদ্ধি পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এদের মধ্যে ধর্মের আবেগ ঢুকিয়ে দেওয়ার আমাদের কী অধিকার আছে?....

ধর্ম বিশ্বাস যদি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা থেকে আসে তবে সোভিয়েটে তা জীবন্ত হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ধর্মপ্রাণ যুবক যুবতী ইচ্ছা করলে যে কোনও গির্জায় গিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক আশার তৃপ্তিসাধন করতে পারে। কিন্তু এটা যদি নেহাৎই মানবিক ও সামাজিক বস্তু হয় এবং একটা বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি অপরিণত ও অবচেতন যুব মনের উপর আধিপত্য করে বেতার ও পত্রিকা প্রচারের দ্বারা এটাকে জীবিত রাখতে চায়, তাহলে সোভিয়েট রাশিয়ায় এটার বাঁচবার কোনও আশাই নেই।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা

সোভিয়েট রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল। রাশিয়ায় যাবার আগেও আমি তা জানতাম। একদলীয় নায়কত্ব কী করে গণতান্ত্রিক হতে পারে এটা জানবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক ছিলাম। সোভিয়েটে থাকাকালে প্রথম বছরে অন্যান্য যে কোনও বিষয়ের চেয়ে একদলীয় পদ্ধতি সম্বন্ধেই আমি বেশি আলোচনা করেছি। আমি প্রশ্ন করতাম, "একটি মাত্র রাজনৈতিক দল নিয়ে কী করে আপনারা গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারেন?" উত্তর পেতাম, "আমাদের একটা দলের চেয়ে বেশি দলের দরকার কী? আমাদের দল হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির দল আর আমাদের রাষ্ট্রও হচ্ছে শ্রমিক রাষ্ট্র। আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করার জন্য আমরা বহু পুঁজিবাদী দলের অস্তিত্ব কামনা করি না"। আমি বললাম, বেশ, মেনে নিলাম। "কিন্তু কর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য হলে কী করেন? বিভিন্ন শ্রমিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন মত থাকতে পারে এবং সে সব মত প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন।" "আমাদের দলের ভেতরেই এসব অনৈক্যের মীমাংসা সম্ভব। ওই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোনও ভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।"...খুশি হলাম না।

সোভিয়েটে একদলীয় শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে এই যে একটা বিরাট গোলমেলে ধারণা, এটা হচ্ছে অনেকটা সেই দল সম্বন্ধে ভুল বোধের ফল। এটি আদৌ একটা পার্লামেন্টারি পার্টি নয়। আমি নিজেও আস্তে আস্তে দলের কার্যাবলি ও সাধারণের এর প্রতি আচরণ দেখে এটা বুঝতে পারি। ১৯৩৩ সালের হেমন্তকালে দল থেকে অবাঞ্ছিতদের সরিয়ে দেওয়ার সময়ে এর ভাল অভিব্যক্তি হয়েছে। আমি তখন ওখানে ছিলাম। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি হল "শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধ অগ্রবাহিনী", মানে সমগ্র শ্রমিক গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ যারা সামাজিক উন্নতির সাধারণ কর্মপন্থা পরিকল্পনার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব নেওয়ার যোগ্য তাদেরই মিলিত সংঘ। কোনও প্রতিষ্ঠানই এই দাবি সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না, যদি না কাজের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ থাকে এবং তার কর্মীরা জনসাধারণের মতের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়। এই পদ্ধতির ফলে প্রত্যেক বছর দলের সকল সভ্য যে এলাকায় কাজ করে সেই এলাকার জনসাধারণের কাছে তাদের কাজের হিসাব নিকাশ দেয়, দেয় তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান কাজের খতিয়ান এবং সব শেষে প্রমাণ করে শ্রমিক শ্রেণির 'সংঘবদ্ধ অগ্রবাহিনী'-র সভ্য হবার দাবির যৌক্তিকতা।

এ ধরনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলে সম্ভাব্য দলচ্যুত সভ্যের পক্ষে বা বিপক্ষে নানা রকম প্রশ্ন ছাড়া কিছু আলোচনাও করতে পারে। এরূপে কোনও কমিউনিস্ট কর্মী তার কাজের গুরুত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করলেও আলোচনা এবং প্রশ্নের ভিতর দিয়ে তার দাবির অযৌক্তিকতা প্রমাণ হয়ে যাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। মানে তার কাজের ভিতর এমন গলদ থেকে যেতে পারে যেটা দলের সুনামের পক্ষে হানিকর বা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনে তার আচরণ এত আপত্তিকর যে সে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনে অক্ষম। এ ধরনের অভিযোগ খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অভাব হলেই তাকে দল থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।...

এ ধরনের একটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে একজন দলচ্যুত সভ্যের বিরুদ্ধে দর্শকদের সামনে লালফৌজের একজন সৈনিক কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করল। এই কমিউনিস্ট কর্মী ১৯১৭ সাল থেকে দলের সভ্য। কিন্তু লাল ফৌজের এই সৈনিকটি তাকে বলশেভিক থাকাকালেই শ্বেত রাশিয়ানদের পক্ষে লড়বার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। এই সৈনিকটি এ ব্যাপারের জন্যই বিশেষ করে তৈরি হয়ে এসেছিল। স্পষ্টতই এই ধরনের প্রশ্ন সেখানে সমাধান হওয়ার নয় এবং অভিযোগকারীকে সমস্ত তথ্য লিখে 'নির্দিষ্ট কমিশনের' কাছে পাঠাবার জন্য বলা হয়। একটা বিশেষ তদন্তের জন্য এটা স্থগিত রাখা হয়। অন্যান্য ব্যাপারে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন, উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করলে, তার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের অবতারণা করা হয়ে থাকে। অন্য দেশের মতো সোভিয়েটে এ ব্যাপারে জনমতের মাপকাঠি রয়েছে এবং সেখানে জনমত কমিউনিস্টদের থেকে আদর্শ জীবন যাপনের দাবি রাখে। পরিশেষে কর্মস্থলে তার আচরণ, দায়িত্বহীনতা, অধীনস্থদের প্রতি কর্তৃত্বের ভাব, অলসতা, এ ধরনের সমস্ত প্রশ্নই সেখানে আলোচিত হয়। ১৯৩৩ সালে রাজনৈতিক কার্যাবলিতে কপটাচরণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দল থেকে অবাঞ্ছিতদের সরিয়ে দেওয়ার সময়ে যে সব কমিউনিস্ট তার পূর্বতন কার্যাবলি অকপটে ব্যক্ত করেছে, এমনকী বিপ্লবের সময়ে তার বিরুদ্ধ মনোভাবেরও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি, তাদের বিরুদ্ধে আমি কোনও সমালোচনা শুনিনি। যতক্ষণ সে একটানা অকৃত্রিমভাবে তার পূর্বাপর ইতিহাস বলে গেছে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে একটিও প্রশ্ন ওঠেনি। যখনই কেউ গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করেছে বা কিছু লুকাবার ভান করেছে, তখনি দর্শকবৃন্দ ও উক্ত কমিশন তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। সোভিয়েটে রাজনৈতিক কপটতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর দুর্নাম। কারও পূর্বতন কার্যাবলি সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দেওয়া মানে এদেশের চাকরিপ্রার্থীর জন্য মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়ার মতোই নিন্দনীয়। দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের বহু কপট রাজনীতিবিদের সোভিয়েটের এই জনপ্রিয় যা চাই-ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থায় পরীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাই নেই।...

পরবর্তী সংখ্যায়

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মছলন্দপুরের প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড কালিদাস মণ্ডল ৪ ডিসেম্বর ৭০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত শতকের নয়ের দশকের প্রথম দিকে তিনি মছলন্দপুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড নুরুল আমিনের মাধ্যমে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। জীবনের শেষের দু' বছর অসুস্থতার সময় বাদে দলীয় কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। পূর্বে তিনি সিপিআই (এম) দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের দুর্নীতি এবং বামপন্থাবিরোধী কার্যকলাপ তাঁকে ব্যথা দিত। এস ইউ সি আই (সি) দলের আন্দোলন, কর্মীদের আচরণ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। দলীয় কাজ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন এবং পরিবারের সদস্যদের দলের অনুগামী করে গড়ে তোলেন।

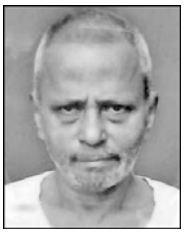

৪ জানুয়ারি দলের লোকাল কমিটির কার্যালয়ে কমরেড কালিদাস মণ্ডলের স্মরণসভার প্রধান বক্তা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে কমরেড কালিদাস মণ্ডলের সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন দেবনাথ।

কমরেড কালিদাস মণ্ডল লাল সেলাম

বে-আইনি খাদানে ধারাবাহিক প্রাণহানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বাঁকুড়ার মেজিয়াতে ১২ জানুয়ারি বেআইনি কয়লা খাদানের ধসে বহু শ্রমিক প্রাণ হারালেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা একশো ছুঁতে পারে। মেজিয়া ব্লকের দামোদর নদের তীর বরাবর দীর্ঘ ২৫ কিমির অধিক এলাকা জুড়ে বেআইনি কয়লা খাদান থেকে প্রায় ২৫-২৬ বছর ধরে একদল কয়লা মাফিয়া কয়লা তুলে চলেছে। ওই খাদানগুলি থেকে প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার গরুর গাড়ি, কয়েক হাজার বাই-সাইকেল ও পাঁচশোর মতো পিকআপ ভ্যান ও লরির সাহায্যে উত্তোলিত কয়লা পাচার করা হচ্ছে। প্রকাশ্য দিবালোকে কোটি কোটি টাকা মূল্যের জনগণের সম্পত্তি লুঠ হচ্ছে। স্থানীয় ও জেলা প্রশাসন নির্বাক দর্শক।

মর্মান্তিক ঘটনা হল, এই ধরনের খাদানগুলিতে ধসের ফলে অভাবের জ্বালায় কয়লা তুলতে আসা অসংখ্য গরিব মানুষের ক্রমাগত মৃত্যু। সব মৃত্যুর খবর প্রচারে আসে না। ২০১৩ সালে একদিনের দুর্ঘটনায় শতাধিক মানুষ মাটি চাপা পড়ে মারা যান। আজও দেহগুলি উদ্ধার হয়নি।

১২ জানুয়ারির দুর্ঘটনার খবর পেয়েই এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ১৩ জানুয়ারি দুয়েকটি সংবাদপত্রেও ওই খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের নৃশংস নরহত্যার প্রতিবাদে বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কমরেড অসিত মণ্ডলের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে যায়। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলে ৭০-৮০ ফুট গভীর পর্যন্ত খনন করে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করতে হবে, মৃতদের পরিবারপিছু ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, বেআইনি খাদানগুলি থেকে কয়লা তোলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, নিরপেক্ষ তদন্তের ভিত্তিতে অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে, এলাকার আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে সন্ত্রস্ত মানুষজনকে নিরাপত্তা দিতে হবে।

এস এস কে এম মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ কেন

এস এস কে এম মেডিকেল কলেজে শেষবারের মতো ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছিল ২০১১ সালে। তৎকালীন শাসকদলের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর হুমকি ও সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে সমস্ত আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল এ আই ডি এস ও।

তারপর রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। পরিবর্তনের স্লোগান তুলে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়। রাতারাতি রাজ্যের প্রায় সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলিতে কোথাও গায়ের জোরে, কোথাও এস এফ আই ইউনিয়নের রঙ পাল্টে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তথাকথিত ইউনিয়ন তৈরি হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায় কলকাতার এস এস কে এম মেডিকেল কলেজ। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কলেজে শাসকদলের সন্ত্রাস ও আক্রমণকে রুখে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনের শক্ত ভিতের উপর ডি এস ও পরিচালিত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২০১২ সালে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর বহিরাগত গুন্ডাবাহিনী নিয়ে টি এম সি পি ইউনিয়ন রুম ও হোস্টেলে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং ডি এস ও কর্মী-সমর্থকদের উপর পাশবিক আক্রমণ করে। এরই সুযোগ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন বন্ধ করে দেয়। এরপর নির্বাচনের দাবিতে গড়ে ওঠে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন। কলেজের দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী এ আই ডি এস ও-র আহ্বানে নির্বাচনের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে তাদের স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে। লাগাতার আন্দোলনের চাপে ২০১৪ সালে পুনরায় নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। কিন্তু আবারও পূর্বপরিকল্পিত সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি করে নির্বাচন বানচাল করে দেয় টি এম সি পি।

কেন বিগত পাঁচ বছর একমাত্র এই কলেজেই ছাত্র সংসদের নির্বাচন করছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ? এই কলেজ বহন করে চলেছে ছাত্র আন্দোলনের এক গৌরবজ্জ্বল ঐতিহ্যকে। ২০০৩-'০৪ সালে পূর্বতন সিপিএম সরকার এস এস কে এম এবং মেদিনীপুর এই দুই সরকারি মেডিকেল কলেজে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি-র বিনিময়ে আসন বিক্রি করেছিল। এই অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে ও মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক ছাত্র-আন্দোলন। যার ফলে শেষপর্যন্ত বাতিল হয়েছিল ক্যাপিটেশন ফি। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। ফলে আন্দোলনের একমাত্র শক্তি এ আই ডি এস ও-র প্রতি ছাত্রছাত্রীদের রয়েছে বিপুল সমর্থন। একে ভিত্তি করেই ২০০৯ সালে এই কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এস এফ আইকে পরাস্ত করে এ আই ডি এস ও-ই বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। পরপর তিনবার ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকে সফলভাবে ইউনিয়ন পরিচালনা করে। ফলে ডি এস ও-র প্রতি সমর্থনের ভিত আরও মজবুত হয়। তাই তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর টিএমসিপি সন্ত্রাস করে ও কর্তৃপক্ষকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন বন্ধ করে দেয়।

গণতন্ত্রের বড়াই করা মুখ্যমন্ত্রীর নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে অবস্থিত একটি প্রথম সারির মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর যাবৎ ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে শাসকদল এ কথাই স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দিয়েছে, যে কোনও মূল্যে ইউনিয়ন দখল করাটাই তাদের কাছে গণতন্ত্র। ডি এস ও-কে নির্মূল করতে টি এম সি পি বারংবার নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে কলেজের ডি এস ও কর্মী-সমর্থকদের উপর। জামিন অযোগ্য একাধিক মিথ্যা মামলায় বহু ছাত্রছাত্রীকে ফাঁসানো হয়েছে। এতসব সত্ত্বেও কলেজে এ আই ডি এস ও-র শক্তিকে দমানো যায়নি। বরং টি এম সি পি-র বিরুদ্ধেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল ঘৃণা।

যে কোনও উপায়ে ইউনিয়ন দখল করার জন্য সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে রাজ্য জুড়ে। জেলায় জেলায় একমাত্র বিরোধী শক্তি ডি এস ও-র ছাত্র প্রতিনিধিদের মনোনয়নপত্র তুলতে না দিয়ে, পাশবিক আক্রমণ চালিয়ে বিরোধী শূন্য নির্বাচনের প্রহসনে জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া টি এম সি পি। এস এস কে এম-এ একইভাবে সন্ত্রাস করে নির্বাচন বন্ধ করেছে টি এম সি পি এবং কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে ডি এস ও।

সরকারের কাজ কি মদ বেচা!

চাষি-শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষ বারবার দাবি তুলেছে খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। সরকারের কানে জল ঢোকেনি। অথচ সেই সরকারই মদের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করছে।

মদের পাইকারি ব্যবসায় নামতে চলেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। এই মর্মে ৫ জানুয়ারি এক নির্দেশিকা জারি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি কর্পোরেশন গড়া হবে। এই কর্পোরেশন বিদেশ থেকে আমদানি করা মদ, দেশে তৈরি বিলিতি মদ, দিশি মদ ও বিয়ার সহ সব ধরনের মদই উৎপাদকদের কাছ থেকে কিনে নেবে। এবং তারাই খুচরো বিক্রেতাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেবে। এভাবে মদ ব্যবসার যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ সরকার হাতেনিতে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ, এই নিগম বা কর্পোরেশন গড়ে তোলায় রাজ্যপাল অনুমোদনও দিয়েছেন। অর্থাৎ মদের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য শুরু হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ক্ষমতায় আসার আগে পূর্বতন সিপিএম সরকারকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ বলতেন, শিল্পবিহীন বাংলায় একটা শিল্পই রমরমিয়ে চলছে, তা হল চোলাই শিল্প। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যবাসীর প্রতি তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় এলে তারা সিপিএমের মতো মদের ঢালাও লাইসেন্স দেবে না। কিন্তু অন্যান্য বহু প্রতিশ্রুতির মতো এই প্রতিশ্রুতিও তারা ভঙ্গ করে। পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য মদের দোকানের লাইসেন্স দেয়, মদ বিক্রির সময়সীমাও বাড়িয়ে দেয়, কমিয়ে দেয় মদ নিষিদ্ধের (ড্রাই ডে) দিন সংখ্যা। স্কুল-কলেজের কাছে মদের দোকান খোলার নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়। মদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হল, জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনও মদের দোকান খোলা যাবে না। এই নির্দেশিকার প্রচার ও তা কার্যকর করার ক্ষেত্রেও তৃণমূল সরকার কোনও গুরুত্ব দেয়নি। পূর্বতন সিপিএম সরকারের মতোই এই সরকারও রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাত তুলে মদের ব্যবসার লাইসেন্স দিতে থাকে।

সরকার চালাতে রাজস্ব প্রয়োজন। কিন্তু মদের প্রসার ছাড়া কি রাজস্ব আদায়ের বিকল্প জায়গা নেই? সরকার পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড় না দিয়ে, তা পুরোপুরি আদায় করে কি রাজস্বের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে না? সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করে, এম এল এ, এম পি-দের বেতন অস্বাভাবিক না বাড়িয়ে, নানা মেলায়-উৎসবে অর্থের মোচ্ছব না করে টাকার সংকট তো অনেকটাই মেটানো যায়। সেসব না করে সরকারি উদ্যোগে মদ বেচার আয়োজন কেন? সরকারের কাছে কি রাজ্যবাসী এই দাবি করেছে? না কি রাজ্যবাসীর দাবি মদের প্রসার রোধ কর?

সুপ্রিম কোর্ট কেন বলছে, জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ৫০০ মিটারের মধ্যে মদের দোকান করা যাবে না? কারণ, সমীক্ষা বলছে, পথ দুর্ঘটনা এবং তাতে মৃত্যুর একটা সিংহভাগের ক্ষেত্রে চালকরা থাকে মদ্যপ অবস্থায়। ডাক্তাররা কেন মদ্যপানের বিরোধিতা করেন? কারণ মদ্যপান শরীরের বহু ক্ষতি করে। মহিলারা কেন দাবি তুলছেন, মদের লাইসেন্স বন্ধ কর? কারণ নারীদের উপর অত্যাচারের যত ঘটনা ঘটছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারীরা-অপরাধীরা মদ্যপ। মদের সরকারি ব্যবসা চালু করে এ রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কি এই বিপদকেই বাড়িয়ে তুলছেন না?

প্রশ্ন উঠছে আরও। রাজ্যের কৃষকদের বরাবরের দাবি, কৃষিপণ্য সরকারি উদ্যোগে কিনতে হবে। ফড়ে চক্রের মতো মিডলম্যানরা যেভাবে কৃষকদের জলের দরে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করছে এবং প্রবল লোকসানের মধ্যে ফেলছে তা আটকাতে হলে কৃষিপণ্যের সরকারি ক্রয় অত্যন্ত জরুরি। একইভাবে জরুরি, নায্য দামে তা বিক্রি করে মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে রাখা। সরকার কি এটা করতে পারে না? ধান, পাট সহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে চাষি ও ক্রেতাদের স্বার্থে সরকার এসব কিছুই করছে না, কিন্তু মদ নিয়ে তাদের উৎসাহের শেষ নেই।

মগরাহাটে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট থানার অন্তর্গত রাধানগর ভূতনাথ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন কর্তৃপক্ষ ভর্তির সময় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সরকারি নিয়মের বাইরে ২৪০ টাকার পরিবর্তে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৪০০ টাকা এবং নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০০ টাকা করে আদায় করছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ এ আই ডি এস ও-র প্রতিবাদে কর্ণপাত না করায় সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিভাবকদের সংগঠিত করে বিদ্যালয় অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। ১০ জানুয়ারি সকাল থেকে এই অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং বর্ধিত ভর্তি ফি-র টাকা ফেরতের দাবিতে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শতাধিক অভিভাবক ও ছাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিতে যায়, কিন্তু অনড় কর্তৃপক্ষ দাবি মানতে না চাওয়ায় অভিভাবকেরা কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভ চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। পুলিশ এসেও আন্দোলনরত অভিভাবকদের টলাতে পারেনি। অবশেষে জয়েন্ট বিডিও-র মধ্যস্থতায় কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে সরকারি নিয়মে ভর্তি এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া বর্ধিত ফি-র টাকা ফেরত দেবার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। জয় হয় আন্দোলনের। এই জয় ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক তথা গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

এ আই ডি এস ও-র জেলা সভাপতি কমরেড রামকুমার মণ্ডল এই জয়ের জন্য অভিভাবকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান এবং আগামী দিনে শিক্ষার স্বার্থে ছাত্র-অভিভাবক কমিটি গড়ে তুলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ডি এস ও-র উপর হামলা টি এম সি পি-র

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই কেউ যাতে ডি এস ও-র প্রার্থী না হয় তার জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ক্লাসে ক্লাসে, এমনকী বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখিয়েছে। তা সত্ত্বেও ৯ জানুয়ারি ডি এস ও কর্মীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে টিএমসিপি কাউন্টার আটকে রেখে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেয়। ১০ জানুয়ারি ডি এস ও-র ইউনিট সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী চৌধুরী, ছাত্রকর্মী রবীন টুডু, শুভব্রত হাইতকে ব্যাপক মারধর করা হয়। ছাত্রীকর্মীরাও ছাড় পাননি। এক গোছা মনোনয়নপত্র কলেজ আধিকারিকদের সামনেই ছিঁড়ে ফেলা হয়। এত সন্ত্রাস সত্ত্বেও ১৮টির মধ্যে ৭টি মনোনয়নপত্র ডি এস ও জমা দিয়েছে।

জিয়াগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে রানি ধন্যকুমারি কলেজে ১৩ জানুয়ারি ডিএসও কর্মীরা নির্বাচনের নোটিস আনতে গেলে টিএমসিপি-র বহিরাগত বাহিনী তাদের উপর হামলা করে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড সাবির আলি, কোষাধ্যক্ষ কমরেড সুরজিৎ দাশগুপ্তকে তারা মারধর করে। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অর্পিতা রায়কেও তারা হেনস্থা করে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে ট্যাক্স চাপানোর প্রস্তাব বাতিল কর

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রে আমানতকারীদের উপর ট্যাক্স বসানোর চিন্তাভাবনা করছে। কালোটাকা লেনদেনের উপর নজরদারির জন্য এটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা হলেও, আসলে তা জনগণকে বিভ্রান্ত করার আর একটি কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। ইদানীং পার্লামেন্টকে এড়িয়ে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার যে রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে এক্ষেত্রেও তাই হতে চলেছে— সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই প্রস্তাব কার্যকর করা হলে, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত সহ সাধারণ মানুষ এই বাড়তি খরচ মেটাতে বাধ্য হবেন।নগদ বা নগদহীন লেনদেন এমনকী নিজের টাকা আদান প্রদানের জন্যও তাঁকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে। সকলেরই স্মরণে আছে, ২০০৫ সালের ১ জুন পূর্বতন কংগ্রেস সরকার হিসাব বহির্ভূত কালো টাকা, তার উৎস এবং গন্তব্যস্থল চিহ্নিত করার এই একই অজুহাত তুলে ব্যাঙ্কিং ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স চালু করেছিল। কিন্তু ঘোষিত এই সব উদ্দেশ্যের একটিও পূরিত হয়নি। জনগণের চাপে ২০০৯ সালে তা বাতিল হয়।

সরকার যেভাবে নানা অজুহাতে জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাচ্ছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তারা হয়তো এবার শিল্পপতি ও কর্পোরেট মালিকদের ট্যাক্স মকুব, ব্যাঙ্ক ঋণে ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি জনগণের উপর রাস্তায় হাঁটার জন্য ভ্রমণ কর এবং শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন কর ধার্য করবে। ভুক্তভোগী মানুষদের প্রতি আমাদের আবেদন, দেশব্যাপী শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলুন, যাতে সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য হয়।

বি আই এফ আর তুলে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ

এ আই ইউ টি ইউ সি-র

বি আই এফ আর (বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন) তুলে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এ আই ইউ টি ইউ সি)। ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন,

'এই সিদ্ধান্ত জনবিরোধী শ্রমিকবিরোধী এবং চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। বি আই এফ আর এক সময় গঠন করা হয়েছিল শিল্পের রুগ্নতা ও বন্ধ হওয়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং তা দূর করে শিল্পের পুনর্গঠনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করার জন্য। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সংস্থাটি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের স্বার্থে এবং রুগ্নশিল্পের পুনরুজ্জীবনে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল। সংস্থাটি তুলে দিলে, শ্রমিকদের যতটুকু সামাজিক সুরক্ষা ছিল, তাও তাঁরা হারাবেন এবং বেতন-গ্র্যাচুইটি-পি এফ সহ বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। অন্যদিকে সরকারি বা বেসরকারি নিয়োগকর্তারা কেবলমাত্র নিজেদের সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে শিল্প এবং শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যা খুশি তাই করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যাবে, এমনকী নিজেদের দেউলিয়া দেখিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেবে।

হীন উদ্দেশ্যে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবি, বিষয়টিকে আসন্ন ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সে সংশ্লিষ্ট সকলের আলোচনার জন্য রাখা হোক। জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন'।

দুর্গাপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ

বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে অ্যালয় স্টিল কারখানায় সরকারি বিনিয়োগ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে ৯ জানুয়ারি দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের সামনে শ্রমিকরা সারাদিন ধরে অনশন করেন এবং অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। এতে এ আই ইউ টি ইউ সি, সিটু, ইনটাক এবং এ আই টি ইউ সি ইত্যাদি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছিলেন। প্রায় ১০০০ জন শ্রমিকের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সহ সভাপতি কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিশ্বনাথ মণ্ডল।

মৈপীঠে মহিলা সম্মেলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মৈপীঠে ১১ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে চার শতাধিক মহিলা এই সম্মেলনে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং নারী নির্যাতন ও মদ-জুয়া-সাট্টার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কল্পনা দত্ত। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস মাধবী পণ্ডিত, সীমা পণ্ডা এবং জেলা কমিটির সদস্য মানসী বেরা।

১১৭তম 'উলগুলান' বার্ষিকী উদযাপন

ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাই-জেশনস-এর আহ্বানে এবং সদস্য সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন-গুলির সহযোগিতায় ৯ জানুয়ারি কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে মুণ্ডা বিদ্রোহ 'উলগুলান'-এর ১১৭ তম বার্ষিকী পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শত শত মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট সাঁওতালী সাহিত্যিক সারদাপ্রসাদ কিসকু। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মুর্মু, সম্মাননীয় অতিথি নেপাল থেকে আগত পরমেশ্বর মুর্মু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারত মুণ্ডা সমাজের কোষাধ্যক্ষ কৌশল্যা মুণ্ডা ও বীরসা মুণ্ডার বংশধর আশ্রিতা টুটি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সীতারাম টুডু, সিদো-কানহু হুল বাইসী-এর সুলেমান মারাণ্ডি। ওড়িশার মুণ্ডারী সাঁওয়ার জামদার সভাপতি নন্দলাল সিং, ঝাড়খণ্ড ভারত ভূমিজ সমাজের সভাপতি সুদর্শন ভূমিজ, আদিবাসী মহাসভার সভাপতি বিজয় কুজুর, ত্রিপুরার প্রতিনিধি বীরসা সাঁওতাল, অল আসাম চা জনগোষ্ঠীর জাতীয় মহাসভার কার্যকরী সভাপতি রামনাথ ভূমিজ, ওড়িশা ভূমিজ সুযার সংঘের হাডিঙ্ক সর্দার প্রমুখ। এই সভা থেকে সভাপতির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের হাতে ৩৫ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি বিসম্বর মুড়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সমস্ত বক্তাই ঝাড়খণ্ড সরকারের 'ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট' ও 'সাঁওতাল পরগণা অ্যাক্ট'-এর প্রতিবাদ করেন। সর্বশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল পরিমল হাঁসদা। সভা সঞ্চালনা করেন ফেডারেশনের সহ সম্পাদক জগদীশ সিং। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সাংস্কৃতিক দলের নাচ গান পথচলতি বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পাচার রোখার দাবিতে

শিশু পাচারের বিরুদ্ধে ৭ জানুয়ারি ক্যানিং সাতমুখী বাজারে শিশুদের মিছিল

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী বুক স্টল নং ৪৬৮

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org